দামুড়হুদায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জরাজীর্ণ বাঁশের সেতুতে ভৈরব নদী পারাপার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ও নতিপোতা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী দুলালনগর-নতিপোতা এলাকায় ভৈরব নদীর ওপর নির্মিত একটি জরাজীর্ণ বাঁশের সেতুর ওপর নির্ভর করে চলাচল করছেন কয়েকটি গ্রামের হাজারো মানুষ।

দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত সেতুটি বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে চলতি বর্ষা মৌসুমে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দুলালনগর, নতিপোতা, কালিয়াবকরি, প্রতাপপুর, গোপালপুর ও ভগীরথপুরসহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষের জন্য ভৈরব নদী পারাপারের অন্যতম ভরসা এই বাঁশের সেতু। স্থানীয় বাসিন্দারা জগন্নাথপুর বাজার, ব্যাংক, মহাজনপুর কলেজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাতায়াতের জন্য প্রতিনিয়ত এটি ব্যবহার করছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেতুটি দিয়ে কোনো রকমে মোটরসাইকেল ও সাইকেল পারাপার করা গেলেও পণ্যবাহী বা অন্যান্য যানবাহন চলাচল সম্ভব নয়। ফলে কৃষিপণ্য পরিবহন কিংবা অসুস্থ রোগীকে গন্তব্যে পৌঁছাতে তাদের হেমায়েতপুর-চারুলিয়া হয়ে অতিরিক্ত ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার পথ ঘুরে যেতে হয়। এতে সময় ও অর্থ উভয়েরই অপচয় হচ্ছে।

দুলালনগর গ্রামের বাসিন্দা রমজান আলী ওরফে টিটন বলেন, “বহু বছর ধরে আমরা এই বাঁশের সেতুর ওপর নির্ভর করে চলছি। একটি স্থায়ী সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের হলেও এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি। চুয়াডাঙ্গা, দামুড়হুদা কিংবা মেহেরপুরে যেতে হলে এই ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পার হতে হয়, যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক।”

একই গ্রামের পূর্বপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ফারুকুজ্জামান বকুল বলেন, “মাঠ থেকে ফসল ঘরে তুলতে কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে যেতে অতিরিক্ত পথ ঘুরতে হওয়ায় কৃষকদের ভোগান্তি ও ব্যয় দুটোই বাড়ছে। আমরা দ্রুত একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জানাই।”

স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম জানান, বিভিন্ন সময়ে সরকারি কর্মকর্তারা এসে স্থান পরিদর্শন ও পরিমাপ করে গেলেও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে হতাশা বাড়ছে।

সেতুটির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় ইজারাদার নাজমুল হোসেন জানান, প্রায় দেড় লাখ টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি বছর সংস্কার কাজেও ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নিয়মিত টোল না দেওয়ায় ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বর্ষার তীব্র স্রোতে যেকোনো সময় সেতুটি ভেসে যেতে পারে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী খালিদ হাসান বলেন, “সেতুটির বর্তমান অবস্থা আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। সেখানে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তাবনা পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। জনগণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে সতর্কতার সঙ্গে সেতুটি ব্যবহার করার অনুরোধ জানাচ্ছি।”

সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুটিই জীবনের লক্ষ্য অর্জনের মাপকাঠি নয়

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) ও সাংবাদিক মনির হায়দার বলেন, সাফল্য এবং ব্যর্থতা এ দু’টিই জীবনের লক্ষ্য অর্জনের মাপকাঠি নয়। অবশ্যই সফল হতে হবে তোমরা পড়তে এসেছ, বড় কিছু হবে, সরকারি চাকরি করবে, বড় জায়গায় যাবে, বড় ব্যবসায়ী হবে কিংবা বড় নেতা হবে এই লক্ষ্য তো থাকতেই হবে। কিন্তু এটাই জীবনের চূড়ান্ত

লক্ষ্য নয়।

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য তাহলে কী? জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সার্থকতা। সাফল্যের পাশাপাশি জীবনটাকে সার্থক হতে হবে, জন্মকে সার্থক করতে হবে। আর সার্থকতার অর্থ কবি কামিনী রায়ের দুই লাইনে “সকলের তরে সকলে মোরা, প্রত্যেকে মোরে পরের তরে।” তোমার জীবন যদি শুধু তোমার জন্যই হয়, তবে সে জীবন সার্থক নয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রঙিন সাজ, আনন্দ উল্লাস আর মধুর আবহে অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুর সরকারি কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য এসকল কথা বলেন তিনি।

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মনির হায়দার বলেন, নতুন পথচলা শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠারও পথ দেখায় কলেজ জীবন। স্বপ্ন বড় হবে, পথ চলা হোক আলোকিত। আমরা সকলেই সফল হতে চাই, তোমরাও সফল হওয়ার জন্যই এই লেখাপড়ার পথ বেছে নিয়েছ এবং এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে এসেছ। তোমরা তো জীবন মাত্র শুরু করেছ লেখাপড়া করবে, পেশাগত জীবনে ঢুকবে, অনেক কষ্ট করে অনেক কিছু অর্জন করবে, সফল হবে তারপর একদিন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ কে এম নজরুল কবীরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক খেজমত আলী মালিথ্যা।

অতিথিরা নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধে বড় হয়ে ওঠার আহ্বান জানান। এছাড়া কো-কারিকোলাম অ্যাক্টিভিটিস, সামাজিক কার্যক্রমসহ মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কলেজকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরার পাশাপাশি একটি মানবিক সমাজ গঠন করার আহ্বান জানান।

নবীনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র বিধান শেখ এবং দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র উলফাতুন নেছা পূর্ণিমা।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্ত ছিল ফুল ছিটিয়ে নবীনদের বরণ করে নেওয়া। প্রবীণ শিক্ষার্থীরা হাতে রঙিন পাপড়ি ছিটিয়ে নবীনদের

স্বাগত জানালে ক্যাম্পাসজুড়ে তৈরি হয় উৎসবমুখর এক আবহ।

পরে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য, কবিতা আর নাট্য পরিবেশনায় মাতিয়ে রাখেন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

আত্মহত্যাই জীবনের মূল সমাধান নয়

তীব্র কষ্ট, হতাশা ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মিলিত অভিজ্ঞতা এবং জেনেটিক, মনস্তাত্তিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণসহ অন্যান্য নেতিবাচক উপাদানের সম্মিলিত ফল আত্মহত্যা।

যখন কোনো ব্যক্তি তার বিবেক, বুদ্ধিমত্তা বা বিচার বিবেচনা হারিয়ে ফেলে তখন সে নিজেকে হত্যা করে। নিজেকে হত্যা করাই আত্মহত্যা। আত্মহত্যা এক অর্থে আত্ম খুন-নিজেকে নিজে খুন করা। আত্মহত্যা বলতে এমন এক ধরনের মৃত্যুকে বুঝায়, যেখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা নিজের হাতে নিজের জীবন সংহার করে। এটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে না বরং বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা ব্যক্তির আত্মহত্যা করার প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।
প্রতিটি মানুষই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে আফসোস করে আমাদের জীবন কেন এত ক্ষণস্থায়ী? এত সুন্দর পৃথিবী, এত সুন্দর জীবন আর জীবনের সাথে সম্পর্কের এত মধুর বন্ধন ছেড়ে কে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে চায়? এ প্রশ্নের উত্তর, ‘না’।
প্রিয়জনকে ছেড়ে কেউই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায় না। পৃথিবীতে এমন একজনও সুস্থ মানুষ পাওয়া যাবে না যে কি না মৃত্যুর কথা মনে করলে আঁতকে ওঠে না। তবু কিসের আশায় মানুষ নিজের জীবনকে নিজেই হত্যা করছে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই সামনে চলে আসে আত্মহত্যার করুণ রূপ!

বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেলা মেহেরপুর। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও, আত্মহত্যার মতো এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে রুপান্তরিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের নেই কোনো সরকারি

পরিসংখ্যান। কিন্তু মেহেরপুরের তিনটি থানা ও তিনটি সরকারি হাসপাতালে তথ্য ভয়াবহ।
সংবাদ মাধ্যমের তথ্যমতে ২০২৪ সালে জেলার তিনটি থানায় নথিভুক্ত হয়েছে ১১৯টি অপমৃত্যুর ঘটনা। এর মধ্যে ৫৯ জন গলায় ফাঁস দিয়ে এবং ২৯ জন বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। বাকিরা ঘুমের ওষুধ, উঁচু স্থান থেকে লাফিয়ে পড়া বা অন্যান্য পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন।চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত অপমৃত্যুর সংখ্যা পৌঁছেছে ৪৬-এ। এর মধ্যে ২২ জন আত্মহননের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন ফাঁস, ১৭ জন বিষপান করেছেন, বাকিরা অন্যভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়েছেন।

তবে যে চিত্রটি সবচেয়ে গভীর দুশ্চিন্তা তৈরি করে, সেটি হলো আত্মহত্যার চেষ্টাকারীদের সংখ্যা। মেহেরপুরের তিনটি সরকারি হাসপাতালে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ২২৭, মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪৫ এবং গান্ধীর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৮৯ জন, মোট ৩৬১ জন নারী, পুরুষ ও শিশুকে পাকস্থলী পরিষ্কারের জন্য ভর্তি করা হয়েছে। যারা কেউ ঘুমের ওষুধ, কেউ বিষ বা কীটনাশক খেয়েছেন আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে।চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন অন্তত ৪০ জন। অর্থাৎ, গড়ে প্রতি ১২ ঘণ্টায় একজন মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন এই জেলায়।

জেলা তথ্য অফিস দাবি করছে, তারা গত পাঁচ মাসে ৩২টি সচেতনতামূলক সভা ও ১৬টি নারী সমাবেশ করেছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কেন্দ্রের তথ্যমতে প্রায় তিদিনই আত্মহত্যার চেষ্টাকারী রোগী আসেন। কেউ বিষ পান করে, কেউ ঘুমের ওষুধ। বাঁচলেও তারা বাকি জীবন জটিল রোগে ভোগেন। কখনো কিডনি নষ্ট হয়, কখনো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যান।

আত্মহত্যা যে কত নির্মম, আত্মহত্যা যে কত নিষ্ঠুর-তা কেবল প্রিয়জন হারা মানুষগুলো বুঝতে পারে। মৃত্যুর ওপারের জীবন কেমন আমাদের জানার সুযোগ নেই। তাই হয়তো বেঁচে থাকার এপারের জীবনে মানুষ এমন কিছু ঘটনার সম্মুখীন হয় যে ঘটনায় তার জীবন হয়ে ওঠে অতি তুচ্ছ যা হননে একজন মানুষ জীবনের মহত্ত্ব একটি মুহূর্তের জন্য ভুলে যায়। এই নিষ্ঠুর ঘটনা হতে পারে একটি ঘটনা অথবা কয়েকটি ঘটনার সমন্বয় যা রূপ নেয় ভয়ংকর বিষণ্নতায় মোড়া এক অলীক পরিণতির।

আত্মহত্যা নিয়ে মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক ভুল ব্যাখ্যা, ভয়

এবং কুসংস্কার কাজ করে। প্রতিটি আত্মহত্যার পেছনে যিনি আত্মহত্যা করেন, তার নিজস্ব কিছু কারণ থাকে। প্রতিটি মানুষ আলাদা, আবেগ-অনুভূতিও আলাদা। আমি যেভাবে পৃথিবীকে দেখি, আরেকজন সেই দৃষ্টিতে পৃথিবী দেখবে না। তাই কেউ কেন সুইসাইড করল, এটা চট করে বলা খুব কঠিন। ডাক্তাররা কারণ বের করার চেষ্টা করেন, কিন্তু একজন মানুষের মনের মধ্যে ঠিক কী ঘুরছে এটা বোঝা কঠিন। কেন সে এই সময়ে আত্মহত্যা করলো এটা জানাও প্রায় অসম্ভব।

অধিকাংশ মানুষ বুঝেই না বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে কেন লোকে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।তারা জানে না সিচুয়েশনাল অথবা ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের কথা।তারা এটাও জানে না বাইপোলার, সিজোফ্রেনিয়া ও বর্ডারলাইন ডিজিজ কী?আত্মহনন থেকে বেঁচে ফেরা অনেক রোগী ডাক্তারকে বলেছেন যে, তারা যখন আত্মহত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা তাদের প্রিয়জনদের কথা ভাবেনি। কারণ তখন তাদের কাছে নিজেদের ব্যথাটাই খুব বেশি ছিল। মনে হতেই পারে এটা খুব স্বার্থপরের মতো আচরণ। মানুষ আত্মহত্যা করে শুধু নিজে পালিয়ে বাঁচার জন্য, অন্য কারো জন্য মরে যাওয়াটা সুইসাইড নয়।সে আসলে নিজে বাঁচার উপায় হিসেবেই মৃত্যুকে বেছে নেয়।তবে হ্যাঁ,একেকজনের কারণটা থাকে একেক রকম।

আত্মহত্যার কারণ যদি বিশ্লেষণ করি তবে, শিশুকালে যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন, সংসারের দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধের স্মৃতি মানুষের ওপর ভীতিজনিত চাপ তৈরি করে, যা আত্মহত্যার কারণ হতে পারে, এমনকি অনেকদিন পরে হলেও হতে পারে। মাদক ও মদ্যপান মানুষের সুইসাইডের আশংকা বাড়িয়ে তোলে। এ ছাড়া, সম্পর্ক ভেঙে গেলে, চাকরি হারালে, আয়ের পথ না পেলে, সামাজিক পজিশন হারালে,লজ্জা পেলে, বুলিং ও ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হলে, আটক হলে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে। ক্রমাগত অসুস্থতাও আত্মহত্যার কারণ, তবে কম।বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার, বাবা-মায়ের মধ্যে সুসম্পর্কের ঘাটতি, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, পরকীয়া, প্রেমে ব্যর্থ হওয়া, দীর্ঘদিনের দরিদ্রতা,ঋণগ্রস্ত, প্রতারণার শিকার হওয়া,শত্রুর কাছে ধরা না দেওয়া,ব্যবসায় বড় ধরনের ক্ষতি, প্রিয়জনের মৃত্যু, পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না পাওয়া, সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের অবহেলা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব, সাইবার ক্রাইমের শিকার হওয়া, ইভটিজিং, মানসিক অসুস্থতা,হতাশা ও অসহায়ত্ব বোধ থেকে কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় এই পথে পা বাড়ায়।যেসব মানুষ তাদের জীবনে এ ধরনের জটিল

সমন্বিত সমস্যার মুখোমুখি হন, তাদের আচরণের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। আত্মহত্যার উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা ও মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে বেশির ভাগ আত্মহত্যার ঘটনাগুলো ঘটে থাকে।

যখন কারও জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক ও উপলব্ধি-অনুধাবন শক্তি লোপ পায়, নিজেকে অসহায়-ভরসাহীন মনে হয়, তখনই ধর্ম-কর্ম ভুলে মানুষ আত্মহত্যা করে বসে। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, সে শুধু তার নিজের ওপরই জুলুম করে না বরং এতে মা-বাবা, ভাইবোনসহ আত্মীয়-পরিজন সবাই খুব কষ্ট পায় এবং অত্যন্ত বিচলিতবোধ করে।পরিবারের একজন সদস্যের মৃত্যু তার পরিবারের উপর ভয়াবহ প্রভাব রাখে। কারণ মানুষটির এই না বলে চলে যাওয়াটা, সেই মানুষটির একার বিষয় নয়। মৃত মানুষের পরিবার-পরিজন সারাজীবন একটা উত্তরবিহীন প্রশ্ন, অতৃপ্ত মন এবং গভীর শূন্যতা নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেয়।’

বিশ্বখ্যাত মনোবিশ্লেষক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, মানুষের অবচেতনেই থাকে ‘মৃত্যুপ্রবৃত্তি’। পরিবেশ–পরিস্থিতির প্রভাবে এই মৃত্যুপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, আর তখনই হয় তার ‘মরিবার সাধ’। গবেষণায় দেখা যায়, মানবমস্তিষ্কের সেরিব্রোস্পাইনাল তরলের মধ্যে ‘৫-হাইড্রোক্সি ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড’ নামের একটি রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ কমে গেলে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যায়। প্রথমে বিক্ষিপ্তভাবে মনের মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা আসে। এই চিন্তাগুলো পরে বারবার আসতে থাকে। ব্যক্তি এ চিন্তা থেকে সহজে মুক্ত হতে পারে না। আত্মহত্যার চিন্তা তার স্বাভাবিক কাজকর্মের ওপর প্রভাব ফেলে। তীব্র থেকে তীব্রতর হয় তার আত্মহননের ইচ্ছা। সে ভাবে, ‘কেন আমি বেঁচে থাকব?’ সে জীবনের ইতি টানার চিন্তা করে। একসময় তার মনে হয়, তার মরে যাওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। কখনো আবেগতাড়িত হয়ে, আবার কখনো পরিকল্পনা করে সে মৃত্যুচেষ্টা করে। সফল না হলে আবার তার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে আত্মহত্যার চিন্তা আসতে থাকে। এ চিন্তার চক্র থেকে সে বের হতে পারে না। এটি তার মধ্যে ফিরে ফিরে আসতে থাকে। তাই যে ব্যক্তি কথাচ্ছলেও মৃত্যুইচ্ছা ব্যক্ত করে, ধরে নিতে হবে তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে।আবার পরিবারে যদি আত্মহত্যা বা এর চেষ্টার ইতিহাস থাকে, তবে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও আত্মহত্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়। মাদক গ্রহণ, যৌন নিপীড়নের শিকার, বয়ঃসন্ধিকালে দেহ ও মনের পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারা, আবেগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, ঝামেলাযুক্ত পরিবার আর নিজের যৌন–পরিচিতি নিয়ে

সন্দিহান থাকা কিশোর আর তরুণদের মধ্যেও আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে।

আত্মহত্যার জন্য মিডিয়াও কোন অংশে কম দামী নয়।যে ভাষায় মিডিয়ায় আত্মহত্যার খবর দেই, কিংবা যে ভাষায় আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনা করে, আত্মহত্যাকে আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে, সিনেমায় যেভাবে দেখানোর চেষ্টা করে, সেটার দিকে কি আমরা কখনও ন্যূনতম মনোযোগ দিয়েছি? আমরা হয়তো খেয়ালই করি না মিডিয়ার প্রতিটা সংবাদে, কিংবা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আত্মহত্যাকে এক ধরনের যৌক্তিকতা অজান্তেই দিয়ে দেই।

আত্মহত্যার সংবাদ মিডিয়ায় যত বেশি আসে এবং সেটা যদি অসংবেদনশীল ভাষায় লিখা হয় এবং আমরা যদি সেটাকে ভুলভাবে আলোচনা করি, তাহলে সেটা আরও বহু মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। বিশেষ করে একই রকম পরিস্থিতিতে পড়া একই মানুষ একইভাবে আত্মহত্যা (কপিক্যাট সুইসাইড) করার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

একটা বদ্ধ জায়গায় চারকোল পুড়িয়ে তারপর সেখানে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিংয়ের মাধ্যমে আত্মহত্যার একটা চর্চা শুরু হয়েছিল তাইওয়ানে। এই আত্মহত্যার খবরগুলো যখন পত্রিকায় বিস্তারিত আসতে শুরু করলো তখন দেখা গেলো সে দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা তো বেড়েছেই, সঙ্গে বহু আত্মহত্যাকারী ব্যবহার করছিলেন চারকোলের ওই পদ্ধতি। পরে একই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ে হংকং, চীন ও জাপানেও।

সাম্প্রতিককালে আমরা দেখবো একই রকম ঘটনার প্রবণতা আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে। কোনও কাঙ্ক্ষিত মানুষকে ফোনে অথবা ভিডিও কলে রেখে আত্মহত্যার খবর আমরা খুব বিস্তারিত (অনেক ক্ষেত্রে ছবিসহ) প্রকাশ করছি। এ ধরনের ঘটনা এখন বাড়ার প্রবণতা দেখা

সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন আত্মহত্যা একটি সামাজিক বিষয় বা ফেনোমেনা। প্রতিটি আত্মহত্যার ঘটনা সেদেশেরই সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং মানুষের মনো-সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। রাজশাহীর আত্মহত্যার তালিকায় যারা আছেন, তাদের মধ্যে সবচাইতে আলোচিত হচ্ছে পয়লা বৈশাখের দিন নন্দনগাছি স্টেশনে ষাটোর্ধ্ব রুহুল আমিনের আত্মহত্যার ঘটনা। তিনি খুব ঠান্ডা মাথায় ট্রেনের নিচে শুয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। সেই ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।প্রথমে ভিন্ন কারণের কথা জানা গেলেও পরে পরিবার থেকে জানানো হয়, ঋণের বোঝা বইতে না পেরে তার এমন

সিদ্ধান্ত। পিঁয়াজ চাষের জন্য তিনি ঋণ নিয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন এনজিও, মহাজন ও কিছু ব্যাংক এভাবেই কায়দা করে মানুষকে ঋণ দেয়। এবং একসময় ঋণভারে জর্জরিত করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে।

সম্প্রতি আলোচিত ঘটনা মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন র্যাব কর্মকর্তা এ এস পি পলাশ সাহা। মরদেহের পাশেই পড়ে ছিল একটি চিরকুট। সেখানে লিখে তিনি নিজের মৃত্যুর দায় নিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকেই বলছেন পলাশ সাহা আসলে জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। সংক্ষিপ্ত চিরকুটটিতে পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে যা লিখেছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তিনি মূলত পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে এই কাজ করেছেন।

এই কষ্ট বয়ে বেড়াতে বেড়াতে ব্যক্তি এতোটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে, একসময় নিজেই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটা নিজেকে একধরনের শাস্তি দেয়া। সেই সাথে মৃত ব্যক্তি হয়তো মনেকরেন দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত চরিত্রগুলো যদি একটুও শিক্ষা পায়। এই আত্মহত্যার মাধ্যমে পলাশ সাহা পরিবারের প্রতি তার ক্রোধ প্রকাশ করেছেন।

একজন মানুষ ঠিক কী কারণে জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চান, এটা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো উপসংহারে পৌঁছানো কঠিন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সাদি মহম্মদ তকিউল্লাহ ৬৬ বছর বয়সে যখন স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নিয়েছিলেন, সমাজের কাছে তা এক দারুণ বিষাদময় ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আত্মহত্যা নিয়ে মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন, ভুল ব্যাখ্যা, ভয় এবং কুসংস্কার কাজ করে। সাদি মহম্মদের আত্মহনন নিয়েও বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে।এই বয়সে তিনি কেন চলে গেলেন? এরজন্য দায়ী কি তাঁর একাকিত্ব, অতীতের ট্রমা, মায়ের উপর নির্ভরতা, বন্ধু-স্বজনদের পাশে না থাকা ইত্যাদি।

মেহেরপুর সদরের পুতুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পারিবারিক চাপ, সমাজের প্রত্যাশা, কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতা শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

পুতুলের মানসিক চাপের একটি বড় অংশ আসে পারিবারিক ও সামাজিক প্রত্যাশা থেকে। বিশেষ করে বাংলাদেশে পরিবার ও সমাজ শিক্ষার্থীদের ওপর উচ্চ প্রত্যাশা আরোপ করে। তাঁদের অনেক সময় এই চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষত যদি তাঁরা একাধিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। এ ধরনের চাপ শিক্ষার্থীদের মানসিক

স্থিতিশীলতা নষ্ট করে এবং তাঁরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

পরিশেষে, সময় বদলে গেছে। তার সাথে পাল্টে গেছে আমাদের জীবন ধারা। তাই আমাদের আরও ভাবতে হবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে। ইন্টারনেট আসক্তি, সমাজের অরাজকতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, চাকরিজীবী অভিভাবকের সন্তানের জন্য সময় কম দেওয়া, প্রিয়জনের সাথে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া, ফেসবুকের বিমূর্ত বন্ধুর মাঝে বুদ হয়ে থেকে সামনের বন্ধুকে ভুলে যাওয়া, ভিডিও গেমসের জগতে গিয়ে বিকেলে মাঠের ফুটবলের চল হারিয়ে যাওয়ার মতো কারণগুলোকে নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের।জীবনে আঘাত, দুঃখ, বেদনা, কষ্ট আসে জীবনকে শক্ত করার জন্য; মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য নয়। মনে রাখতে হবে, মৃত্যু আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয়, বেঁচে থাকাটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা চাই, মানুষ নিজেকে ভালবেসে বেঁচে থাকুক, আত্মহত্যার এই দুঃখগাঁথার ইতি ঘটুক।

সুপেয় পানির অভাবে ৪৬৭ জন কাটাচ্ছেন দুর্বিষহ জীবন

“পানির অপর নাম জীবন” কিন্তু সেই পানিই আজ জীবনকে বিষাক্ত ও বিপন্ন করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, আধুনিক কৃষিতে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও দর্শনা এলাকায় এর প্রভাব মারাত্মক।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামে ২৫৮টি টিউবওয়েলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এ গ্রামে প্রায় ৪০০ জন নারী- পুরুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। গত ২৫ বছরে এ গ্রামে আর্সেনিকজনিত রোগে মারা গেছেন ১৪ জন। অন্যদিকে, দর্শনার ডিহিকৃষ্ণপুর গ্রামের গাবতলা পাড়ায় প্রায় ১৮৫ জন আক্রান্ত এবং ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮ জনে।

আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই আছেন দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক যন্ত্রণায়। কারও কারও হাত-পায়ে গুটি, বাদামি দাগ, চামড়া পুরু হয়ে যাওয়া,

আঙুল বেঁকে যাওয়া এবং অসাড়তা দেখা যাচ্ছে। কারও পেটের সমস্যা, খাদ্য হজমে ব্যাঘাত, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত দেখা দিচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানায়, আর্সেনিক আক্রান্তদের মধ্যে অন্তত ২৫০ জন স্বাস্থ্য কার্ডধারী।

২০০২ সালে জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকার সহায়তায় বড় দুধপাতিলা গ্রামে একটি আর্সেনিকমুক্ত ওয়াটার ট্যাংক স্থাপন করা হলেও এখন তা অকেজো হয়ে পড়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ও এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথের বাস্তবায়নে বড় দুধপাতিলা ও হরিরামপুর গ্রামে ৪০ লাখ ৪২ হাজার ৭০০ টাকা ব্যয়ে দুটি পাইপ লাইন ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ১৬৮টি পরিবার সেখানে কমমূল্যে বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে। এগুলোর একটি পরিচালনা করছেন বড় দুধপাতিলা গ্রামের বকুল হোসেন।

তবে এসব ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ডিহিকৃষ্ণপুর গাবতলা পাড়ার বাসিন্দারা প্রতিদিন ৩-৪ বার অন্যের বাড়ি থেকে পানি সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানকার যুবক সবুজ জানায়, তাদের গ্রামে ১৯৯৯ সালেই প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে। এখনো অনেক টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিকযুক্ত, কিন্তু বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়ে সেটাই ব্যবহার করতে হচ্ছে।

জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের তথ্যমতে, দামুড়হুদা উপজেলায় ১১,০২২টি শ্যালো টিউবওয়েলের মধ্যে ৮,৬২৩টি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ১,৮৬৪টি টিউবওয়েলে আর্সেনিক রয়েছে। দর্শনা পৌরসভায় পরীক্ষা করা ৪,৭৭৩টি টিউবওয়েলের মধ্যে ১,০৬৭টিতে আর্সেনিক ধরা পড়ে।

ভুক্তভোগীরা জানান, আর্সেনিকজনিত রোগের স্থায়ী চিকিৎসা নেই। এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে নতুন একটি আর্সেনিকমুক্ত ডিপ টিউবওয়েল বসানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়াউদ্দিন বলেন, “প্রথমে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, এরপর আক্রান্তদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।”
এদিকে, জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আমিনুল ইসলামের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।